প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার কালে (১৮১৭), এদেশে ইংরেজের শাসন, পলাশীর যুদ্ধ থেকে ষাট বছর, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী স্বত্ব লাভ থেকে (১৭৬৫) কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে।

ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতায় নতুন নয়, অতীতে ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি অনেকবারই উন্নত ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা পরিণামে বিজিত হয়েছে। ইংরেজদের বেলায় এ অভিজ্ঞতা মেলেনি।

"Indian society has no history at all, atleast no known history. What we call its history, is but the history of successive intruders, who founded their empires on the passive basis of that unresisting and unchanging society .... The British were the conquerors superior and therefore inaccessible to Hindoo civilization."[১]

তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের উন্নত শক্তি, শিল্প বিপ্লব শক্তি ইংল্যাণ্ড, এ দেশের মধ্যযুগীয় নিরুদ্যমশীল শাসন ব্যবস্থায়, এই সর্বগ্রাসী উপস্থিতি দ্বারা সার্বিক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। শাসন কার্যের প্রয়োজনে, সুতরাং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, কলিকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ফলে, এদেশীয়দের মধ্যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান- সমৃদ্ধ একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জন্ম নিয়েছিল। এঁরা ইংরেজদের শিল্প-সাহিত্য- বিজ্ঞান, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চা দ্বারা এদেশের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন তুলেছেন; ~~ঘটনা~~ সমাজের এই পাশ্চাত্যায়ন, সমাজের একটি বিশেষ অংশে-ও অনুপ্রবিষ্ট হল।

এই বিস্তারের কালে, শাসকবর্গের প্রয়োজন ছাড়িয়ে সার্বিক ভাবের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে, বাংলা গদ্যভাষা চর্চার প্রয়োজন অনুভূত হোল।

শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্য চর্চার আদি পর্ব সূচিত হয়েছিল ~~উইলিয়াম~~ উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই বাঙালিদের হাতে গদ্য ব্যাপ্তি পেয়েছিল। শাস্ত্রযুক্ত কেন্দ্রিকতা থেকে, যুক্তিচর্চার পথকে আশ্রয় করে, রামমোহন, বাংলা গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

রামমোহনের বাঙালাগদ্য প্রথমাবধিই আধুনিক চিন্তার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণে, বাঙালা দেশের সামাজিক – রাষ্ট্রিক– অর্থনৈতিক– ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রবল বিতর্কের ও পরস্পরবিরোধী মতবাদের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবেই বাঙালা গদ্য ভাষা গড়ে উঠেছে –সৃজনশীল সাহিত্যের আঙিনায় নয়। আধুনিক বাঙালাগদ্য জন্মলগ্নেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত। বাঙালা গদ্যচর্চার আদিপর্বে গদ্য-নির্মিতির ব্যাপ্তির জন্য অনুধ্যান, রামমোহন ও উত্তরসূরীদের গদ্যচর্চার দিক-অন্বেষা আরও তীব্র।

কোম্পানির এদেশীয় শিক্ষানীতি, শুরু থেকেই প্রাচ্য–পাশ্চাত্য রীতির মধ্যে দোদুল্যমান থাকলেও,১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোম্পানি, সরকারী ভাবে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে স্থির করেন নি।

"The decision to make English the medium of higher education was announced in a brief resolution on 7th March 1835. 'His Lordship is of opinion', said the first paragraph of the resolution, 'that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and sciences among the natives of India, and that all the funds appropriated for the purpose of education would be employed on English Education only." [2]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশীয় ধনাঢ্য সমাজমুখ্য ও বিদেশী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। সংস্থার নিয়ামকদের নির্দেশে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও ইওরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পঠন পাঠনের দ্বারা, জীবন ধারণের স্বল্পপ্রয়োজনভিত্তিকতা থেকে, নৈতিক ও দৈহিক গঠন ভিত্তিক করে, কলেজের পরিচালকেরা শিক্ষার নতুন মূল্যবোধ প্রচার করেন। এই একই কালপর্বে, ইংরাজী-মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গেই ,সকল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার মাধ্যম হিসেবে, বাঙালাগদ্য ভাষাকে গড়ে তোলার চেষ্টাও লক্ষণীয়। আধুনিকতার জন্য যারা উনিশ শতকী জন প্রাণিত হয়েছেন, তা ইওরোপীয় বৌদ্ধিক চর্চা ও সাহচর্যজাত, ধর্ম– দর্শন– শিক্ষা-রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি –সমাজ সংস্কার –মানবিকতা, এই সকল বিষয়েই ইওরোপীয় চিন্তা ও ধ্যান ধারণা, এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা আত্মস্থ করেছিলেন, উনিশ শতকী ব্যাপী , বাঙালাদেশের

ভাবজগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহ তারই প্রতিক্রিয়া । এ কাহিনী যার যে-কোনো আলোচনায় তৎবিষয়ক ইওরোপীয় চিন্তার তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধান অপরিহার্য । আধুনিক বাঙলাগদ্যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিবর্তন সন্ধানে, ইওরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক দর্শন ও আন্দোলনের সাধারণ ইতিহাস অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয় । এই কাহিনীর ভেতর সেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট করা যায় 'ইউটোপীয়' সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা বলে । এক্ষেত্রে পশ্চিম ইওরোপীয় ভাবচিন্তাকেই আমরা অনুসরণ করেছি, কারণ ইংরাজী ভাষাচর্চায় ও ইংরেজ সংসর্গে, ইওরোপের এই অংশের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাই, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল ।

বাঙলাদেশের ভাবজগতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস চর্চার সঙ্গে সঙ্গে যে যুক্তিচর্চা শুরু হয়েছিল রামমোহনে । নবজাগরণে মানবের ও পৃথিবীর অপার সম্ভাবনার আবিষ্কার, পারত্রিকতার পরিবর্তে ঐহিকতার চর্চার উৎসাহ, এদেশে, রামমোহন । ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই রামমোহন, বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সীমাহীন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন । এ সত্য অনুভবে তিনি জানতেন যে, সকল আলোচনার উপযুক্ত বাঙলাগদ্যভাষা গঠনে বিলম্ব, বাঙলাদেশের আধুনিকতার উত্তরণে বাধার কারণ হবে । তাঁর বাস্তববোধ, আধুনিকতাকে বাঙলা গদ্যভাষা-গঠন-সচেতন করেছিল ।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের শক্তি নিয়োজিত ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনে, শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে, এবং অংশতভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, মানবিকতা, সামাজিক সমানাধিকারের ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের বৌদ্ধিক চর্চায় । ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রত্যয়গুলিকে পুষ্ট করেছিল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মহিমা সমূহ । এদেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলনই জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথ নির্মাণ করেছে ।

সমকালীন ইওরোপের সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের সঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ছিল; ইংল্যাণ্ডে, রামমোহন তৎকালীন ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন । মানবের স্বাধীনতা ও বন্ধনমুক্তিতে রামমোহনের উল্লাস তো ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেরই উল্লাস । বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে, জাতীয়তাবাদী চিন্তায় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা গ্রথিত ।

ইওরোপের ইউটোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, গত শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী প্রভাবিত হলেও, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাকেন্দ্রিক কোনো সংগঠিত গণ আন্দোলন,

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত, এদেশে ব্যাপ্তি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই চিন্তা সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে একটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই, এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ও তারই দীর্ঘ কার্যকারণে বাঙালা গদ্য-ভাষাচর্চার আধুনিক চেষ্টা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শুরু। ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণত জমির মালিক, কোম্পানিসৃষ্ট জমিদার সম্প্রদায়, ও ব্যবসাবাণিজ্যে, ঠিকাদারি ও বেনিয়ানগিরি-সূত্রে নব্য ধনিকশ্রেণী ক্রমশঃ এদেশের সামাজিক নেতৃত্বে এসে যান, এবং কোম্পানির সমকালীন ভূমি ও রাজনীতি ও অর্থ ব্যবস্থার কৌশলে, ঠিকাদারি বেনিয়ান কর্মে অর্জিত বিপুল ধনরাশি, জমিতে নিয়োজিত হতে থাকায়, জমির সঙ্গে ঐতিহ্যগত ভাবেই সম্পর্কিত পরিবার সমূহ, জমি থেকে উৎখাত হল নব্য ধনিক শ্রেণীদের দ্বারা, সামাজিক নেতৃত্ব থেকেও অপসারিত হল। এ দেশীয় মূলধন, কোম্পানির ঘোষিত নীতির ফলে, শুধুমাত্র জমি ও কোম্পানির কাগজে নিয়োজিত হতে পারত। মূলধনের নিজস্ব ধর্মও অন্য ভাবায় সংক্রমিত হয়ে যায়।

এদেশের সমাজচিন্তায় আধুনিকতার উদ্ভব ঘটেছে জমিকেন্দ্রিক শ্রেণীর মধ্যেই শ্রেণীমধ্যস্থিত আধুনিকতার অনিবার্যতায়। বাঙালাদেশের দেওয়ানী লাভের আগে-পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ জুড়েই, এদেশীয় সমাজের ভাঙা গড়া তো, কখনও কোম্পানির, কখনও কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্বার্থেই ঘটে যায়। ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মূলধন এসেছে, এদেশীয় সূত্রে, বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের নিকট থেকে, কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে ঠিকাদারি কারবার, তখন এদেশীয় ধন-উপার্জনের অন্যতম সহজ পথ। অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী-ব্যবসায়ী, ও সেই ব্যবসায়ে দেশীয় অর্থ সরবরাহকারী, এই তিনের স্বার্থের ঐক্য ঘটে যায় বলেই, বাঙালাদেশের ঐতিহ্যগত শিল্প ব্যবস্থাকে ধ্বংস হতেই হয়। ইংল্যান্ডের তৈরি বাজারে এদেশীয় সুতা রেশম কাপড়ের চাহিদা পূরণের দ্বারা কোম্পানির অভূতপূর্ব আর্থিক লাভ ও ইংরেজ কর্মচারী-ব্যবসায়ীদের এদেশের অন্তর্বাণিজ্যের প্রায় এক চেটিয়া অধিকারের ফলে অচিন্তনীয় সম্পদ সংগ্রহ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ভারতবর্ষের সম্পদকে, ইংল্যান্ডে উদ্বৃত্তে পরিণত করে। এই সম্পদই তো শিল্পবিপ্লবের মূলধনে পরিণত হয়ে ইংল্যান্ডের সম্মুখে এক স্বপ্নময় নতুন ভবিষ্যতের দুয়ার উদ্ঘাটিত করে দেয়; আর একটি গ্রাম-কেন্দ্রিক, কৃষি ও কুটির শিল্প নির্ভর প্রাচীন সভ্যতা, সম্পূর্ণ সমাজ

বিবর্তনের দায় ও আরোপিত আধুনিকতার ভার নিয়ে একান্তই সুরহীন অন্ধকারের তিমিরে ডুবে যেতে থাকে অনিবার্য।

দেওয়ানী লাভের পরবর্তীকালে, ভূমি-ও কোম্পানির অর্থ উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে আবিস্কৃত হয়ে যায়। আর সেই সূত্রে, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজবিন্যাসের ঐতিহ্যগত এদেশীয় কাঠামো ভেঙে পড়তে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা, ভূমি থেকে কৃষক উৎপাটিত হয়ে যায়, কৃষকও যেন ভূমি পণ্যে পরিণত হয়। এই বন্দোবস্তে জমি-নির্ভর একটি নতুন সমাজ কাঠামো নির্মাণের অর্থ ও শুরু হয়ে যায়। কৃষক ও ভূমি, মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃষক, ভূমি ও মধ্যস্বত্বভোগী, এবং কৃষকসহ স্বত্বভোগী-ভূমি ও কোম্পানির সরকার, এই বিবিধ সম্পর্কের টানাপোড়েনে, ভাঙাগড়ায়, নতুন কাঠামোর সমাজ সম্পর্কের ও বিন্যাসের ন্যায় স্থির হতে থাকে। ভূমিকে ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে দিয়ে, নতুন শাসকেরা, এদেশের অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্যকে বিচ্যুত করে দেন। আবার ভূমি ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে এদেশীয় মূলধনের ও এদেশের ভূমিতে ইউরোপীয় মূলধনের প্রয়োগনিষেধ, নির্ভরমান অর্থ ব্যবস্থাকেও জটিল করে তোলে। বেনিয়ান মুৎসুদ্দি দেওয়ানি ও নীলের ক্ষেত্রে ইংরেজ সহায়তায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্জিত সম্পদ, ভূমিতে নিয়োজিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে দেশীয় মূলধনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সমাজক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়ে যায়। এবং একমাত্র ভূমিই এদেশীয় সম্পদ ব্যবহারের একমাত্র ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায়, সম্পদের স্বাভাবিক চলিষ্ণুতা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে পুঞ্জীভূত সম্পদ, নিজস্ব নিয়মে, অনুৎপাদক শক্তির তাড়নায় নতুন পথ সন্ধান করে। সমাজদেহেও এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়।

রামমোহনের পূর্বে, বাঙালা গদ্যভাষা, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক নতুন চিন্তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আধুনিক বাঙালা গদ্যচর্চার প্রাথমিক শুরু সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সঞ্চারিত হয়নি। কারণ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনও অসংহত এবং সেই কারণেই সামাজিক-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে তখনও অসমর্থ। এই আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়ার জন্য, আধুনিক বাঙালা গদ্যভাষাকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশক নীতিসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগের সরকারী কর্মের সূত্রে, জন ডিগবির সহায়তায় পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার সাহচর্যকে আত্মস্থ করে, রামমোহনের

স্থায়ীভাবে কলিকাতা নগরীতে আসা পর্যন্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাত নতুন অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার সহায়ই তো রামমোহনকে সম্ভব করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এদেশীয় সমাজ বিকাশের মূল ভিত্তি ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত সামাজিক বিন্যাস। এই সামাজিক বিন্যাসই ভূম্যধিকারী শ্রেণীকে হিন্দু কলেজ স্থাপনায় ব্রতী করে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই এদেশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালকদের ইংরেজী জ্ঞানচর্চার নিমিত্ত, ভূমিকেন্দ্রিক নতুন সামাজিক নেতৃত্ব-বর্গ কোম্পানিরই সহিত নেতৃত্বের প্রধান সাংস্কৃতিক-শিক্ষার মাধ্যমেই একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলে।

রামমোহন সৃষ্ট সমাজ-ধর্ম সংস্কার অতিক্রমই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা নতুন প্রেরণা পেয়ে যায়, পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার মধ্যে। ভূমিকেন্দ্রিক রক্ষণশীল সমাজ দ্বিতীয় প্রজন্মের আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এদেশের সমাজবিকাশের আধুনিকতা আকাঙ্ক্ষিত গতি পেয়ে যায়। রামমোহনেরই আধুনিকতায় দীক্ষিত বাঙালী গদ্যভাষাও সেই আধুনিকতার-তাড়নাতেই ক্রমশঃ দূর থেকে দূরান্তরে নীত হয়। এদেশীয় সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবর্তনের গতির অস্ত্রই শস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে হতে, আধুনিক বাঙালী গদ্য তীক্ষ্ণ অমোঘ হয়ে ওঠে।

বাঙালী গদ্য ভাষায় ক্রমবিবর্তিত একটি সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের যার উদ্ভব ও বিকাশ, সমাজ আধুনিকতার অনুসর-অনুসরণে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের অনুসরণও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দেশীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতায় সম্পন্নভোগী শ্রেণীর ক্ষোভ, সমাজদেহেও এক ধরনের বিক্ষোভ সৃষ্টি করেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়, পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চা জাত পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টি। এই বিক্ষোভ স্ব সমাজের কূপমণ্ডুকতা ও প্রাচীনত্বকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। কারণ ইতিমধ্যেই, মুসলমান শাসনের অবসানে ইংরেজ শাসনের শুরুতে, এদেশীয় হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সমাজবিকাশের ইতিহাসে, এবং তার অন্তরঙ্গের সাথে বাঙালী গদ্যভাষা, গ্রহণে বর্জনে, সংশ্লেষণে ও প্রকাশে, গঠন বৈচিত্র্যে ও নির্মাণকুশলতে, এই সময়ে সমগ্রের ভারসাম্যকে ও ভাব অনুসারিত সমাজ আন্দোলনকে অবলম্বন করেই বিবর্তিত হয়েছে। অতএব আধুনিক বাঙালী গদ্যে সমাজ-তাত্ত্বিক চিন্তার বিবর্তন, সমকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে বিচার্য।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার সাহচর্যে, সভ্যতার ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অনুসরণে, এদেশের ভাবজগতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সূচনা করলেন। রামমোহনের নেতৃত্বে, এই শ্রেণী সনাতন হিন্দুধর্ম শাসিত সমাজের আচার সর্বস্বতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। ইয়ংবেঙ্গল, রামমোহনের আধুনিকতাকে আরও ব্যাপ্ত করেছিলেন। এঁরা কখনই দল হিসেবে সংগঠিত হননি, বা কোনো বিশেষ আন্দোলনেরও জন্ম দেননি, তথাপি উনিশ শতকীয় সার্বিক পরিবর্তনের প্রবাহকে এঁরা একটি অন্যতর মাত্রা দিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ-ও করেছেন। এঁরা বাংলা গদ্য চর্চা না করলেও, বাংলা গদ্যের বিষয় ভাবনায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেছেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী চেতনায় জাতীয়তা-বাদ ক্রমশঃ স্পষ্ট অবয়ব পাচ্ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বৌদ্ধিক চর্চায় ইওরোপের সমাজ ও দর্শনের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মানবতাবাদ, উপযোগবাদ, বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গেই এদেশীয় ঐতিহ্য আবিষ্কারের, ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির নতুন ব্যাখ্যার কর্ম ও সাধিত হচ্ছিল। এর সঙ্গেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এদেশীয়দের অনুপস্থিতি, শাসক শ্রেণীর উপেক্ষার ফলে প্রাপ্ত তীব্র আবেগ, দেশের বিদেশী নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থায় দেশীয় মূলধন বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আবির্ভাব অনিবার্য করেছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা, ইউরোপীয়ান সমাজচিন্তার যে-আদান বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা গদ্যরচনায় ছড়িয়ে রেখেছেন, তার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করতে হবে তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোকে, শিক্ষা ও ধর্মান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

উনিশ শতকীয় বিশের দশকেই, ডিরোজিও-র শিষ্য, যুক্তি ও বস্তুবাদ, পারিবারিকতার পরিবর্তে ঐহিকতার চর্চা, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা, মানুষ ও মাতৃভূমির সম্ভাবনার মূলানুসন্ধান, বিভিন্ন প্রবন্ধের মননে ও বোধে প্রতিফলিত হয়ে যায়। জ্ঞানচর্চা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস, ও নব্য সমাজতাত্ত্বিকদের দর্শনচিন্তার আগমন ফ্রান্স ও আমেরিকার ইতিহাস, ইওরোপের বিভিন্নদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই প্রবন্ধ অনুধ্যানেও, নূতন বিষয়ে নতুন চিন্তা জাগিয়ে তোলে। বাস্তব প্রয়োগ-পরিকল্পনাহীন এই বোধে, ইংরেজ শাসনের অনিবার্যতা যেন নিয়তি নির্ধারিত। ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে, প্রশাসনে ও শাসন পরিষদে পদ গ্রহণের দ্বারা, এদেশীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা

এ চিন্তার মুখ্য উদ্দেশ্য । তথাপি, এই যুক্তি চিন্তা, স্বদেশ ও সমাজের মধ্যযুগীয় আচার ও সংস্কার সর্বস্বতা, দিশাহীনতা, সনাতন হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের পরিবর্তন-বিমুখতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ সমাজ দর্শনের আবির্ভাব ঘটায় ।

এই জ্ঞানচর্চায়, পাশ্চাত্যসমাজতত্ত্বের ও রাষ্ট্রতত্ত্বের শাস্ত্রচর্চার সঙ্গেই ছিল, ইওরোপীয় সাহিত্যচর্চা । শিল্পী সাহিত্যিকদের তৃতীয় নয়নেই তো কালের প্রথম ছায়াপাত ঘটে, অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় নতুন কল্পের সূত্র ও । এই সাহিত্য সংস্পর্শে এদেশের নতুন প্রজন্মের অন্তর্বিশ্ব ও শিক্ষিত হতে থাকে, সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাতে ভাঙাগড়ায়, আধুনিক সমাজচিন্তা ক্রমশঃ স্পষ্ট অবয়ব পেতে যায় । এই সমান্তরালে, নতুন ভাবতত্ত্বের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে, বাঙলাগদ্য ভাষাও বিবর্তিত হতে থাকে, নতুন সমাজ বোধের জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে । জনসংযোগের দায়, গদ্যভাষা, প্রাচীনকাল থেকেই বহন করেছে, — রাজকীয় পত্রে, বৈষ্ণব ধর্মচর্চায়, দলিল দস্তাবেজে, বাইবেলের অনুবাদে এই জনসংযোগের দায় নতুন করে বাঙলাগদ্য ভাষাকে বহন করতে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত দেশীয় প্রেক্ষায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেই, ইংরেজ শাসনের আপাত অস্থিরতার ক্রমসংহতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার স্থিরতা লাভ, এদেশীয় মননে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চায় আধুনিক ভাবতত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে যায় । এই আলোচনায় এই ভাবতত্ত্বের বিবর্তনের সঙ্গেই বাঙলাগদ্যভাষার বিবর্তন দেখানো হয়েছে ।

আধুনিক গদ্যভাষার উন্মেষ ও বিকাশ, আধুনিক সমাজচিন্তার উন্মেষ ও বিকাশের অনুসারী । সমাজ সংস্কার চিন্তা ও আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সমান্তরাল অগ্রসর হয় । সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে শিল্পপতির প্রভাব বৃদ্ধি, প্রাচ্য থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের ক্রম সংকোচন, শাসনকর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইংরেজদের সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত ও তার ফল সৃষ্ট বিক্ষোভ — এই সব কারণে পরিবর্তিত হতে থাকে, সিপাহী যুদ্ধোত্তর এদেশীয় প্রশাসনে শিল্পপতির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে, শাসক - শাসিতের একান্ত বশ্যের ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্কেও পরিবর্তন আসে । জাতীয়তাবোধ তাড়িত বাঙলাদেশ, উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ ধরে, শতাব্দীর প্রারম্ভে উন্মেষিত ভাবতত্ত্বকেই, একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে গ্রথিত করে, বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দেয় । বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা ও স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায়, সেই ভাবতত্ত্বই, বরং ও বঙ্গদেশের তীব্র জাতীয়তাবোধ তাড়িত আন্দোলনের

শীর্ষে, স্বাদেশিকতার ভাবতরঙ্গের দোলায়, কখনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিপ্লবী পরিকল্পনায়, কখনও বা জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদের মতভেদে, প্রথম মহাযুদ্ধপর্যন্ত পালিত হতে থাকে।

এই ভাবতত্ত্বের ও তজ্জনিত সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব প্রকাশ-মাধ্যম বাঙলা গদ্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাস, সমাজ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অন্তর্গত দর্শনের সঙ্গে আলোচিত হলেই, গদ্যভাষার উন্মেষ কালের সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে আবিষ্কার করা সম্ভব। এই আলোচনা, এই কারণেই, একই সঙ্গে গদ্য রূ ও একটি ভাবতত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাস। এই আলোচনায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গদ্য লেখকদের এই ভাবতত্ত্ব কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই চেষ্টায় সমাজের প্রতিবেশ বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই ভাবতত্ত্বের আবির্ভাব সমাজ বিবর্তনের জন্য, এবং সমাজচিন্তায় এই ভাবতত্ত্বকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ বাঙলা গদ্য ভাষা বিকশিত। তাই, উভয়ের আলোচনাতেই, গত শতাব্দীর বাঙলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশের বিশদ আলোচনাও অনিবার্য।

সমাজতন্ত্র-কল্পনার সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার বিবর্তনের কালসীমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু অবধি নির্দিষ্ট করার কারণ, এরপর সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা এক বিশেষ রূপের নির্দিষ্টতা পায়—সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের ইতিহাসে তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে মূলতঃ ইউটোপীয়ান সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চর্চার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রমশঃ দানা বেঁধেছে। বিদেশী বুর্জোয়া মূলধনের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া মূলধনের প্রতিযোগিতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা তীব্রতা লাভ করে এদেশীয় অর্থনৈতিক বিবর্তনকে, ও সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। বাঙলাগদ্যভাষা এই চিন্তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল ও জাতীয় বুর্জোয়া মূলধনের আবির্ভাবের ফলে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া কি ভাবে তীব্রতা লাভ করে, সমাজ তান্ত্রিক চিন্তার আগমনে সাহায্য করেছিল, বাঙলা গদ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিবর্তনের এই আলোচনায় এই উপাদান সন্ধান করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই নবজাগরণে বাঙলাগদ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রভাব বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা হয়নি। আধুনিক বাঙলাগদ্যে এই চিন্তার বিবর্তন দেখাতে গিয়ে

সেই অনালোচিত ক্ষেত্রে আলোকপাতের চেষ্টাও করা হয়েছে। সেই সমাজ বিবর্তনের সমান্তরালে মূলে বাঙলা গদ্য ভাষার বিবর্তনের ভিন্ন আলোচনার অভাবই এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ। উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় নবীন সমাজ সম্পর্কের ও সংস্কারের আকৃতিতে গড়ে ওঠা গদ্যভাষার, প্রধানতঃ শিক্ষা-সমাজ-আন্দোলনের ও সৃজনশীল সাহিত্য কর্মেরও প্রভাব মাধ্যমে পরিণত হওয়ার সমাজ-সূত্র অনুধাবনের চেষ্টাও এ আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য।

এই আলোচনাকে প্রধানতঃ তত্ত্ব ও মননমূলক গদ্য সাহিত্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম, উপন্যাস-নাটক বা ছোটগল্প,সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার উদ্ভব ও বিবর্তনকে এ-আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

গ্রন্থসূত্র ঃ-

১. কার্ল মার্কস ঃ দি ফিউচার রেজাল্টস অব দি ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া। মার্কস এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওয়ার্কস। মস্কো, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৭৩। ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪ - ৪৯৫

২. ডঃ সুরেশ চন্দ্র মিত্র ঃ এডুকেশন। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২ সম্পাদক ঃ ডঃ এন কে, সিনহা। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭। পৃঃ ৪৩৪।